আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষাকালীন সংখ্যা

আষাঢ় ১৪৩১

বর্ষা এল বলে। এখনো তার দেখা পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু আকাশে বাতাসে মাঝেমধ্যে যেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একটু হয়ত দেরি, কিন্তু বর্ষার মেঘের ডাক মাঝে মধ্যে কোথায় যেন স্বস্তির ইঙ্গিত বয়ে আনছে সত্যিই। আসুক বরষা। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাক শরীর, মন সব। জল গড়িয়ে নামুক আমাদের অন্তর বেয়ে।জানলার কাচে আবছা হয়ে আসুক শহর গ্রাম। জয় হোক তার। স্বস্তির।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

এ লেখা যখন লিখছি, বিদেশ যাবার জন্য প্লেনে বসে, হাতে এল একটি বহুল প্রচারিত বাংলা পত্রিকা, প্রচ্ছদে তাঁর ছবি, প্রধানমন্ত্রীজির । এমনিতে ঠিক আছে, সেই ক্যারিশমাই যেন অটুট ছবিতে, কেবল চন্দনচর্চিত কপালের লিখনে দৃশ্যত ফাটল ধরেছে।

সে ধরতেই পারে, চন্দন শুকিয়ে গেলে ধরেই থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে যেন একটু প্রতীকী, নিঃসন্দেহে। এবং কথা হল, সে প্রতীক বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের মানুষের কাছে অনেকাংশেই যেন বা কিছুটা স্বস্তির। স্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশন, অর্থবল, স্বস্তিদায়ক বিপুল সংগঠন, হাতের পুতুল-প্রায় পর্যবেক্ষককুল --- সব সত্বেও শেষ হাসিটা কিন্তু হেসেছেন খানিকটা জনগণই। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মানুষ। ফল ? এমনকি উত্তরপ্রদেশ যে উত্তর প্রদেশ, সেখানেও অধিকাংশ আসন কিনা চলে গেল কোথায় ? না, অখিলেশর জোটে। এমনকি অত সাধ করে রাম মন্দির তৈরির পরেকার অযোধ্যাতেও ফৈজাবাদ শূন্যহাতেই বলতে গেলে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারাণসীর ঐতিহ্য তুবড়ে দিয়ে ঝকঝকে করেও সাত লক্ষ মার্জিন দূরস্থান, হয়ে গেল কি না লাখ দেড়েক ! স্বাভাবিক। অন্য ভারত , ক্ষুব্ধ ভারত, জাগ্রত ভারত একটু হলেও যেন একটু নড়ে বসেছে। আবার কপালে তাই ঠেকাতে হল কি ? না, সেই সংবিধানই --- যেখানে জয়গান আছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের, যে ভারতকে কথায় কথায় পাকিস্তানের জুজু দেখানো ছিল প্রিয় ব্যসন, মন কি বাত। এই ভারত বারবার বলেছে বেকারত্বের কথা, দারিদ্র্যের কথা, মূল্যবৃদ্ধির কথা। কানে তোলবার সময় ছিল না। গ্যারান্টি দিয়ে সবকিছু ভুলিয়ে দেবার কথা ছিল। প্রতিশ্রুতি। রাখা যে গেল না সে তো বিরক্তিকর একটিমাত্র শব্দে জেরে, গণতন্ত্র। কেন্দ্রে পোক্ত সরকার চাইলে ওসব ইন্ডিয়া ফিন্ডিয়া , জোট ফোট নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে ! চলে না। কিন্তু কি আর করা যাবে ! মোও ও ও, মো ও ও ও দি স্লোগান যে ভোলা সত্যিই কঠিন !!!! কিন্তু তার বদলে এখন জোটবন্ধুদের পাশে নিয়ে শপথ ! টেনশন : কখন কে কী বিশ্বাসঘাতকতা করল !

যাইহোক, সবকিছু বাদ দিলেও বলার : যাঁরা শপথ নিলেন তাঁদের মনে রাখতে হবে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং সরাসরি সহায়তা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারলে, তবেই কিন্তু একমাত্র ভারতের এখন যা অবস্থা তাতে আগামী নির্বাচন গুলোতে শক্তিশালী অবস্থান নেওয়া যাবে।

সূচিপত্র

যাঁরা এলেন তাঁদের কতটা ভরসা করতে পারবে দেশ Page 5
অলক দাশ মহাপাত্র

ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতাদর্শের লোক নিয়ে এ জোট টিকবে তো ? Page 8
জয়ন্ত ভট্টাচার্য

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (চতুর্থ পর্ব) Page 14
আদিত্য ঠাকুর

পেশীর সুস্থতা খুবই জরুরি Page 17
তাপস দে

কেমন আছে পৃথিবী Page 19
অনুমিতা দেব

দ্রুত বাড়ছে কোলেস্টেরলের সমস্যা Page 21
দেবেশ দাশ

চলো বেড়িয়ে আসি Page 23
ডলি সেন

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (চতুর্থ পর্ব) Page 25
বাবলু সাহা

ফিরে দেখা (চতুর্থ পর্ব) Page 27
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

ইউরোপের ডায়েরি (পঞ্চম পর্ব) Page 29
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

সাত সমুদ্দুর পারের দেশ জার্মানি Page 34
সুমিতা মুখোপাধ্যায়

অন্য জগৎ Page 38
নিজস্ব প্রতিনিধি

লেখা ১

যাঁরা এলেন তাঁদের কতটা ভরসা করতে পারবে দেশ

অলক দাশ মহাপাত্র

শাদির পহেলা রাতে মারিবে মার্জার পরামর্শ মেনে গোড়াতেই যা করার করে দিল মাত্র একজন এম পি নিয়ে মহারাষ্ট্রের এন সি পি গোষ্ঠি। জোট সরকার যে ঠিক কেমন হতে চলেছে , তার আভাস তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই পেয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল মহারাষ্ট্রের এনসিপি অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী। প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল, তাদের দাবি একটাই : পূর্ণ মন্ত্রকই চাই ! নয়তো তারা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। সম্প্রতি এনসিপি অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলকে বিজেপির পক্ষ থেকে নাকি ফোন করে সুখবর জানানো হয়। কিন্তু যখনই তিনি জানতে পারেন যে সেটা স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ, তখনই বেঁকে বসেন। প্রফুল্ল প্যাটেল এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। পাওয়ারের এনসিপি এবার লোকসভা ভোটে মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি যে এরকম দর কষাকষি করতে পারেন, সেটা অবিশ্বাস্য ঠেকেছে মোদি বা অমিত শাহের কাছে। তারপর আবারও অজিত পাওয়ার এবং প্রফুল্ল প্যাটেলকে ফোন করে আপাতত রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অনড় ও আসম্মানিত অজিত পাওয়ার ঘাড় পাততে রাজি নন । শাহ, নাড্ডারা অবশ্য বিষয়টি ভেবে দেখার কথা জানিয়ে আপাতত বিষয়টি

ধামাচাপা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আতঙ্ক অন্য। পাওয়ারের দলের মাত্র একজন এমপি। তিনিই যদি মন্ত্রক বণ্টন নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বকে চোখ রাঙাতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে বাকি জোটশরিকদের আচরণ কেমন হবে ?

সমস্যা কম নয়। হিসেব বলছে একদিকে পদ্মে ভোটের হার যেমন ভূমিধসের মতো নেমেছে অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত হলেও 'হারিয়ে যাওয়া' কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি আকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছে। স্লোগানে ৪০০ পারের ধ্বনি তুললেও ২৭২-এর থেকে অনেক দূরেই থেমে যেতে হয়েছে শাহ - মোদীদের। ২০১৯-এর তুলনায় শতাংশের হিসেবে ভোট কম পেয়ে ২৪০টি আসনেই পদ্মের বিজয় রথ ব্রেক কষেছে। কংগ্রেস এবার যে ২১৫টি আসনে সরাসরি লড়েছিল তার মধ্যে বিজেপি জয়ী হয়েছে ১৫৩টি আসনে আর কংগ্রেস জিতেছে ৬২ আসনে।

নরেন্দ্র মোদীর কাছে এবারের নির্বাচনের ফলাফল একটি বড়সড় ধাক্কা বলা যায়।এর আগে মোদী কখনো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে এইভাবে পিছিয়ে পড়েননি।যতটা প্রত্যাশা নিয়ে তিনি গলার শিরা ফুলিয়ে ৪০০ পারের ঘোষণা করেছিলেন, তার থেকেও লড়াই বেশি হাড্ডাহাড্ডি হওয়ায় তৃতীয় দফায় জয়ী হলেও তাঁর হিন্দুত্ববাদী দল আসন পেয়েছে ২৪০, যা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে কম। নির্বাচনের এই ফলাফল নরেন্দ্র মোদীর জন্য খুবই হতাশার এবং দুঃখের। একই সঙ্গে দেখা গেল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোটের বিস্ময়কর উত্থান ঘটল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোদী তথা তার দলের 'আব কি বার, ৪০০ পার' হুংকার মনে হয় ভোটাররা খুব একটা সহজভাবে নিতে পারেননি। মোট কথা যে মোদী তথা তাঁর দলকে এগিয়ে রাখতে 'মোদী ব্র্যান্ড' সেই ব্র্যান্ড কিন্তু পুরোপুরি ম্লান বা জৌলুশ হারিয়ে ফিকে হয়ে অক্সিজেন পেয়েছে কংগ্রেস তথা বিরোধীরা।

এবার চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতীশ কুমার দুজনেই যেমন বিজেপি ও মোদীর কাছে বড় ভরসা, তেমনই সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে তাঁরা এমন কিছু দাবি করেছেন যেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন টিডিপি লোকসভার স্পিকারের পদটির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে জেডিইউ একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম চাইছে। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে তারা একটি কো অর্ডিনেশন কমিটিও চাইছে। কিন্তু প্রশ্ন বিজেপি কি টিডিপিকে স্পিকারের পদ ছেড়ে দেবে ? সেই সঙ্গেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদও দাবি করতে পারেন শরিকরা। কার্যত বিজেপি যে এবার চাপে পড়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। সেই নিরিখে এবার দর কষাকষি করে কে কতটা সুবিধা নিতে পারবে সেটাই দেখার।

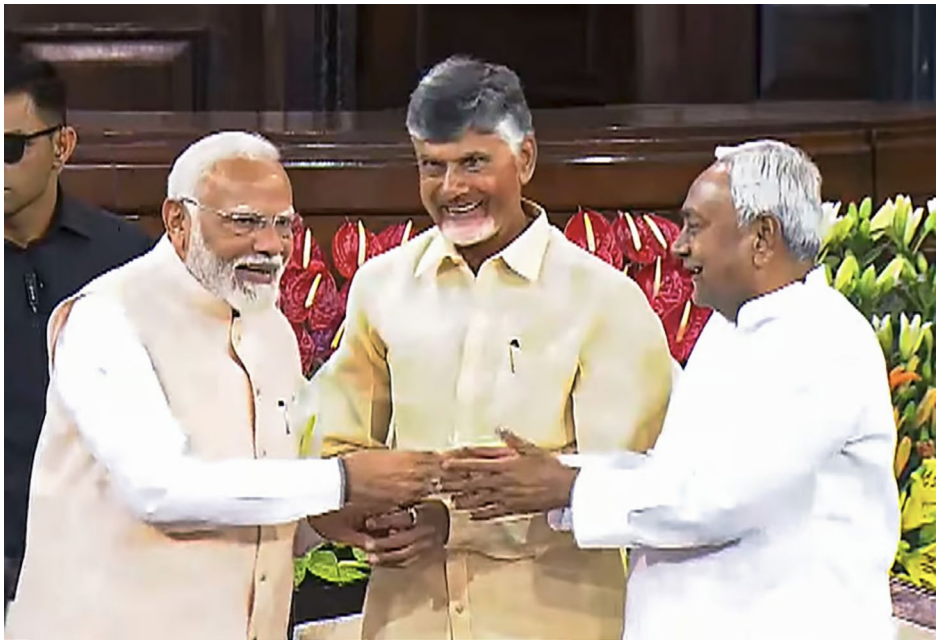

অন্যদিকে , যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে গালমন্দ করেন তাঁদের জন্য এবারের লোকসভা নির্বাচন একটা শিক্ষা। কাশ্মিরে ইউএপিএ ধারায় বন্দি এঞ্জিনিয়ার রাশিদ এবং পঞ্জাবের বন্দি অমৃতপাল সিং এর জেল থেকে জয় সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তির একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান তো আছেই। যেখানে কর্পোরেট শক্তি দিনকে দিন এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাইছে যেখানে তাদের ধান্দা বাস্তবায়ন করতে কোনো বিতর্ক না হয়, সংসদে একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন বাস্তবায়ন হয়, সেখানে এবারের নির্বাচনের ফলাফল একটা বিরাট থাপ্পড়। এই ব্যবস্থাই কর্পোরেট শাসনের উল্টোদিকে জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেছে। মনে হয় যেটা এই মুহূর্তে করা দরকার তা হল এই গণতন্ত্রকে আরও প্রসারিত করার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া। সেই লড়াই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে নয়, একে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার লক্ষ্যের মধ্যে দিয়েই বাস্তবায়িত হতে পারে।

সবথেকে অবাক করে দিয়ে এখানে বামেদের ভূমিকার কথা বলতে হয়। আসলে ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও লোকাল স্তরের বাম নেতারা শুধু মনোগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে চলেছেন ! সারাদেশে এবার একটা বিজেপি বিরোধী হাওয়া ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সেই হাওয়াটার ফায়দা তুলেছে তৃণমূল দলটা। বামেরা এখানে ব্যর্থ যেকোনো কারণেই হোক।

তবে ২০১৯ এর নিরিখে বামেরা ভোট পার্সেন্টেজ কিছুটা বাড়িয়েছে এটাই আশার কথা। প্রায় এক পার্সেন্ট ভোট বেড়েছে। আরো আশা সঞ্চারিত করেছে কিছু তরুণ ছেলে মেয়ে, যারা লড়াইয়ের ময়দানে নেমে যথেষ্ট পরিণত রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

লেখা ২

ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতাদর্শের লোক নিয়ে এ জোট টিকবে তো ?

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

সদ্য সমাপ্ত ভারতের অষ্টাদশতম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পুরোপুরি জানা গিয়েছে, সরকার গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে এই নির্বাচন সম্পর্কে দু' চার কথা এখন লেখা যেতে পারে। এই লোকসভা নির্বাচনকে আমার বহু অর্থেই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই নির্বাচনের সঙ্গে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে অনেক অমিল থাকা সত্ত্বেও, যে প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কোথাও একটি মিলও রয়েছে। সাধারণত স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের অবসানের সঙ্গে আকস্মিকতা বা হিংস্রতা যুক্ত হয়। কিন্তু, ১৯৭৭ সালে ভারতে শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়েছিল। এবারও নির্বাচনের পর, অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের অপসারণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

উনিশশো নব্বইয়ের দশকে উদারীকরণের পর থেকে ভারতের ক্রমশ শক্তিশালী কর্পোরেট জগৎ একুশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে শুরু করে। ২০০৪–২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নেওয়া কিছু পদক্ষেপের ফলে মজুরির হার বেড়ে যায়। এটা ভারতের বৃহৎ

শিল্পপতিদের আদৌ মনঃপূত হয়নি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের বেশ কয়েক বছর আগে থেকে কর্পোরেট মহল ভারতের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচন প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের কর্পোরেট জগতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতাকে বাজারের নতুন পণ্যের মতো উপস্থাপন করা হয়, তাঁকে ভারতের নাগরিকদেরকে দুর্নীতি থেকে মুক্তিদাতা হিসাবে বিপণন করা শুরু হয়। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কর্মীদের মাধ্যমে সেই প্রচারকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শহর ও গ্রামের নাগরিকদের কাছে। পাশাপাশি তত্কালীন শাসক দল ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ও বোধশক্তিহীন বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সুচারুভাবে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়। ২০১৪ সালে যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর যে সরকার গঠিত হয়, তারা প্রথম থেকেই ভারতের কর্পোরেটদের, বিশেষ করে কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারকে অতিরিক্ত সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কাজে লেগে পড়ে। এর পরিণামে কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমজীবী মানুষদের প্রকৃত মজুরি কমে আসে, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে রোজগারহীনতা বেড়ে চলে। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে।

ভারতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতি এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো, কিন্তু ভারতের ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে সেই রাজনীতি কখনওই খুব ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। ২০১৪ সালে প্রথম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী শক্তি কর্পোরেটদের মদতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে সংসদ দখল করতে সক্ষম হলো। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মোকাবিলা করার জন্য অচিরেই শাসক দল ধর্মভিত্তিক ফ্যাসিবাদের পথে পা বাড়ালো। শুরু হলো গো রক্ষার নামে নিরীহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা দিয়ে। তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কব্জা করে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের সমর্থনে মগজধোলাইয়ের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল; শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভকে দেশদ্রোহিতা বলে প্রচার করা হলো। একুশ শতকেও ভারতে কর্পোরেটদের একচেটিয়া ব্যবসার প্রতিরোধ করে চলেছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি। এদের ব্যবসা চলে মূলত নগদ টাকায়। একদিকে নোটবন্দির মাধ্যমে নগদ টাকার সরবরাহ বন্ধ করে কর্পোরেটদের একতরফা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও দেশের পরিকাঠামোগত সম্পদগুলিকে জলের দামে কর্পোরেটদের বিক্রি করার প্রক্রিয়াও শুরু হলো। দেশের লিখিত ও টেলিভিশনের সংবাদ মাধ্যমকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের প্রচার ও বিরোধীদের আক্রমণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো। রাফায়েল বিমানের ক্রয় নিয়ে দুর্নীতির কথা বিরোধীরা তুললেও ভারতের সংবাদ মাধ্যমকে এই নিয়ে কোনও

রকম তদন্তমূলক কাজের কোনও চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনের ক্ষোভ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। ২০১৮ সালের শেষে শাসক দলের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট কমের দিকে চলে যায়।

২০১৯ সালের গোড়ার দিকে ভারতের শাসক দলের জন্য এক অভাবিত সুযোগ করে দেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এক অবিমৃষ্যকারী আচরণ। এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দল আরও বেশি শক্তি নিয়ে সংসদে ফিরে এল। প্রায় প্রথম দিন থেকেই এরা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ‘এক রাষ্ট্র, এক নেতা ’ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনে লেগে পড়ে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে সেখানকার বিধানসভার বিলোপ ঘটানো হয়। বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভয় দেখিয়ে বা অর্থবলে বিধানসভার সদস্যদের কিনে নিয়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলির পতন ঘটিয়ে সেখানে নিজেদের পছন্দমতো সরকার বসানোর কাজ শুরু হয়। ভারতের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন ও অর্থপাচার বিরোধী আইনকে সংশোধন করে যে কোনও নাগরিককে প্রমাণ ছাড়া গ্রেপ্তার ও জামিন না পাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হয়। ভারতের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করার পর ভারতের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার দ্বারা সেই আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা হয়। সংখ্যালঘুদের আবাসস্থলের উপর বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয়, একতরফা ভাবে বিরোধীদের উপর আক্রমণ। ভীমা-কোরেগাওঁ ও দিল্লির দাঙ্গাকে অছিলা করে বেশ কিছু সংখ্যক মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ইডি, সিবিআই, এনআইএ, ইনকাম ট্যাক্স প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নামিয়ে দেওয়া হয় বিরোধী দলগুলির নেতাদের বিরুদ্ধে, পরিষ্কার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হলো – হয় জেলে যাও, নয়তো আমাদের দলে যোগ দাও। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী বা সাংবাদিক কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বিচারব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য বিচারপতিদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি আনুগত্য উভয়েরই সহায়তা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়। এরই সঙ্গে অযোধ্যার রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য বিপুল অর্থ খরচ করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত শাসক দল সুপ্রিম কোর্টকে অগ্রাহ্য করে আইন পাল্টিয়ে নির্বাচন কমিশনকেও নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। একই সাথে, ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে নিজেদের দলের জন্য হিসাব বহির্ভূত অর্থ সংগ্রহের বিনিময়ে কর্পোরেট দুনিয়াকে, বিশেষত এক বিশিষ্ট শিল্পপতিকে যথেচ্ছ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

২০১৯ সালের মতো কর্পোরেট দুনিয়া ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দলের জয়ের জন্য কোনও অভাবিত সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে থাকার পক্ষপাতি ছিল না। তারা এই নির্বাচনে শাসক দলের নেতাকেই একটি ব্র্যান্ড হিসাবে তৈরি করে নির্বাচনের কেন্দ্রীয় বিষয় বলে প্রচারের পরিকল্পনা করে। সম্ভবত দুটি কারণে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমত একটি কেন্দ্রীয় বিষয় থাকলে প্রচারের মালমশলা তৈরি করতে ও পরিকল্পনা করতে অনেক কম খরচ করে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করা যায় আর দ্বিতীয়ত তারা সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন, বিগত এক দশক ধরে ক্রমাগত প্রচারের ফলে তাদের এই ব্র্যান্ডটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। দু' টি বিষয়ে সম্ভবত তাদের ভুল হয়েছিল। প্রথমত, ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এত বেশি সংখ্যক রাজ্যস্তরের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন যে কোনও রকম বড়ো ধরনের গোলমাল করা সম্ভব করা সম্ভব নয় আর দ্বিতীয়ত, শাসক দলের লাগাতার আক্রমণে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হওয়ার পরও বিরোধী দলগুলি পরিকল্পনা করে নির্বাচনে লড়তে সক্ষম। সম্ভবত ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারের আর্থিক মদতপুষ্ট শাসক দলের মনে হয়েছিল আর্থিকভাবে দুর্বল, প্রচারের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বিরোধীরা কিছুই করতে পারবে না। সেই কারণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 'চারশো পার' –এর শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল।

বাস্তবে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দলের নেতার একনায়ক হওয়ার স্বপ্ন প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এই নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি, তাদের অত্যন্ত সীমিত আর্থিক সামর্থ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ক্রমাগত আক্রমণ, বিশেষত দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বহু সংখ্যক নেতাকে কারারুদ্ধ করা সত্ত্বেও, সাহসের সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছে। বিরোধী দলগুলির নেতা ও কর্মীরা ভারতের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নির্বাচনের প্রচারে সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং এর দৌলতে শেষ পর্যন্ত এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্য শুধু মাত্র আসনসংখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়, ভোটসংখ্যার পরিবর্তন

দেখলে আসল পরিস্থিতি বোঝা যাবে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি এবারকার লোকসভা নির্বাচনের বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলেছে, সাধারণ মানুষ তাদের বিশ্বাস করে সমর্থন করেছে, বহু ক্ষেত্রে জিতিয়েছে, শাসক দলের অতিমানব বলে প্রচারিত নেতার বেশ কিছু অস্পষ্ট ও সারবত্তাহীন গ্যারান্টির দিকে আকৃষ্ট হয়নি। আবার একই সাথে, বিভিন্ন রাজ্যের যে সব রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনও আস্থা নেই, তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বললেও তাদের পক্ষে জনসমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়নি। এবার নির্বাচন চলাকালীন সামাজিক মাধ্যমে, বিশেষত ইউটিউব মাধ্যমে, ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রতিবদ্ধ কিছু ব্যক্তিত্বের নিরলস প্রয়াস সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্যকে প্রভূত পরিমাণে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, এবং তার প্রভাব নির্বাচনের ফলেও দেখা গিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁদেরও সাফল্য লাভ করতে দেখা গিয়েছে।

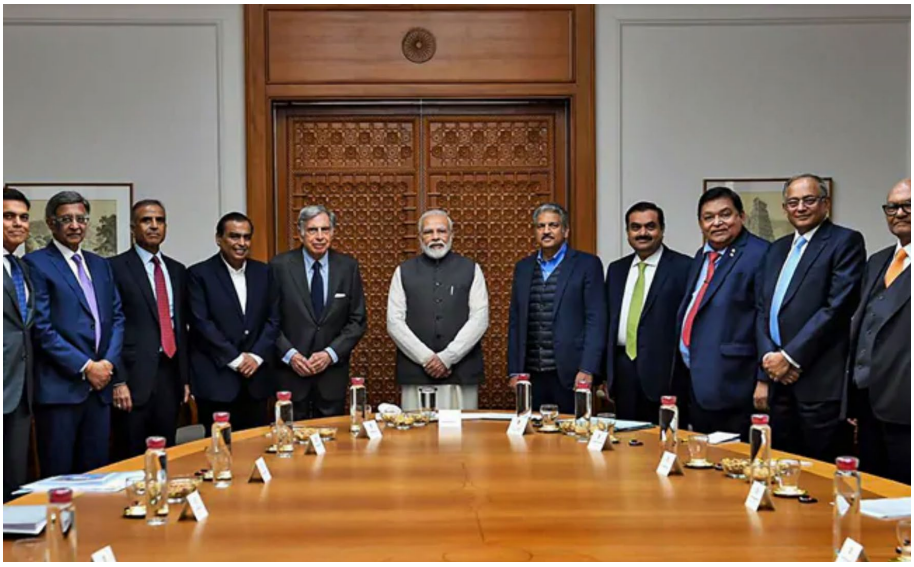

প্রথম দফার নির্বাচনের প্রায় অব্যবহিত পরবর্তী সময়, ভারতের কর্পোরেট মহল বুঝতে পারে তাদের অনেক অর্থ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট শাসক দলের নেতাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস শহরাঞ্চলে সর্বাত্মক প্রচারের ফলে অনেকটা সফল হলেও, গ্রামাঞ্চলে আর সফল হচ্ছে না। তার ফলে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের সময় থেকে শুরু হয়ে যায়, শাসক দলের ইতিপূর্বে বহু বার ব্যবহৃত অতি নিম্নস্তরের ধর্মীয় বিভাজনমূলক প্রচার। পাশাপাশি, শাসক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমে অসংখ্য সাজানো সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে শাসক দলের নেতাকে অতিমানব বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বলে প্রচারও চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সচেতন

মানুষ, অনেকটাই নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করে ভোট দেওয়ার ফলে শাসক দল একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, বিভিন্ন মতাদর্শ বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থনে একটি জোট সরকার গঠিত হতে চলেছে।

এই নির্বাচনে শাসক দলের নেতার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরাজয় ধর্মভিত্তিক ফ্যাসিবাদ ও কয়েক জন বিশিষ্ট শিল্পপতিদের রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ, উভয়কেই কিছুটা দুর্বল করেছে। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত শাসক দলের নেতার যে সযত্ন নির্মিত অতিমানবিক প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তা এই মুহূর্তে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত; তাঁর একনায়কতান্ত্রিক কার্যকলাপও কিছুটা স্তিমিত বলে মনে হচ্ছে। ভারতের কর্পোরেট জগৎ চিন্তিত; নতুন পরিস্থিতিতে কীভাবে জোট সরকারকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই পরিকল্পনায় ব্যস্ত। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমের উপর এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যে গভীর আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তারও সম্ভবত কিছুটা নিরসন হয়েছে। তবে, জোট সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা বন্ধ করবে কিনা তা আদৌ স্পষ্ট নয়। পৃথক পৃথক রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারীদের নিয়ে গঠিত এই জোট সরকার কত দিন টিকে থাকবে তাও বলা কঠিন।

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (চতুর্থ পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

ঋগ্বেদ ও পরবর্তী কালে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল বর্ষগণনা, ঋতুর সময় নির্ধারণ ও বিস্তৃতি। বর্ষ শুরুর দিন ও ঋতুর আরম্ভকালকে প্রায় সর্বদাই কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূচিত করা হত। বেদ, স্মৃতি বা পুরাণে যে সমস্ত ধর্মকৃত্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার সবেরই পিছনে নির্দিষ্ট কারণ নিহিত আছে। সেই কারণে সরস্বতী পূজার দিন শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কোন নির্দিষ্ট জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাকে স্মরণ করেই। সূর্য এবং চাঁদ এই দুটি জ্যোতিষ্ক সময়ের নিয়ামক। সূর্যের উদয় এবং অস্তের সময় সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সূর্য উত্তরের এবং দক্ষিণের দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মাঝে দোলকের মতো দোদুল্যমান। আমরা উত্তর গোলার্ধের বাসিন্দা, সর্বাধিক উত্তর দিশায় সূর্য যে দিন অবস্থান করে, সেই দিনটিকে বলি উত্তরায়ণান্ত বা দক্ষিণায়ন দিবস, ইংরেজিতে Summer Solstice Day. এই দিনটিতে দিনমান সর্বাধিক এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম।

একই ভাবে সূর্য যেদিন সর্ব দক্ষিণ দিশায় অবস্থান করে সেই দিনটিকে বলা হয় দক্ষিণায়নান্ত বা উত্তরায়ণ দিবস, ইংরেজিতে Winter Solstice Day. উত্তরগোলার্ধের বাসিন্দাদের কাছে এই দিনটির দিনমান ক্ষুদ্রতম এবং রাত্রি দীর্ঘতম। বর্তমান কালে প্রধানত দক্ষিণায়ন দিবস আসে ২০ থেকে ২২ জুনের মধ্যবর্তী কোন একটি দিনে। আর উত্তরায়ণ দিবস আসে ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী কোন দিনে। উত্তরায়ণ দিবস থেকে সূর্যের উত্তর দিশায় চলন শুরু হয় এবং এই উত্তরণ শেষ হয় উত্তরায়ণান্ত বা দক্ষিণায়ন দিবসে। এই দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে সূর্য যেদিন আসে সেই দিনটিকে বলা হয় মহাবিষুব দিবস বা বাসন্ত বিষুব দিবস বা বিষুব ক্রান্তিপাত দিবস, ইংরেজিতে Vernal Equinoxial Day. এই দিনটিতে দিন-রাতের মান সমান হয়। একইভাবে সূর্যের দক্ষিণায়ন দিবস থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণায়নান্ত দিবস গমন পথের ঠিক মধ্য অবস্থানে যে দিনটি আসে, তাকে বলা হয় জলবিষুব দিবস বা শারদ বিষুব দিবস, ইংরেজিতে Autumnal Equinoxial Day. এই দিনটিতেও দিন-রাতের মান সমান হয়। এই দুই বিষুব ক্রান্তিপাত দিনে সূর্য ঠিক পূর্বে উদিত হয়ে ঠিক পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

প্রাচীন কাল থেকেই আকাশের এই চারটি বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান তথা চারটি দিন ছিল জ্যোতির্বিদদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যতার ক্ষেত্রেই সৌর বছর গণনা শুরু হত সূর্যের এই চারটি অবস্থানের কোন একটি থেকে। দিনের বেলা চাঁদ ও মাঝেমধ্যে শুক্রগ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা তারা ইত্যাদি দেখা যায়না। ফলে সূর্যের অবস্থান কোন্ তারকা মণ্ডলের বা নক্ষত্রের প্রেক্ষাপটে তা জানতে পরোক্ষ ব্যবস্থা নিতে হয়। এইক্ষেত্রে চাঁদের অবস্থানের সাহায্য নেওয়া হত। চাঁদের কলা বৃদ্ধি বা হ্রাস সহজেই চোখে পড়ে। সম্পূর্ণ গোলাকার চাঁদ সূর্যাস্তের সামান্য আগে বা পরে সূর্যের বিপরীত আকাশে প্রায় ১৮০° ব্যবধানে দেখা যায়। চাঁদের এই কলাকে বলা হয় পূর্ণিমা। তার পরবর্তী দিনগুলিতে চাঁদের কলা একটু একটু করে হ্রাস পেতে থাকে এবং পনের দিন পরে চাঁদ আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদের এই অবস্থান এবং দিনটিকে বলা হয় অমাবস্যা দিবস। অমাবস্যার পরে আবার একটু একটু করে চাঁদের কলা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় পনেরো দিন পরে আবার চাঁদের পূর্ণিমা দেখা দেয়। প্রতিদিনে চাঁদের এই কলা বৃদ্ধি বা হ্রাসকে বলা হয় তিথি। এইভাবে তিরিশটি তিথি পাওয়া যায়। অমাবস্যার ঠিক পর থেকে পূর্ণিমা সমেত পনেরোটি তিথিকে বলা হয় শুক্ল পক্ষ। পূর্ণিমায় অন্ত থেকে অমাবস্যার অন্ত অবধি পনেরোটি তিথিকে বলা হয় কৃষ্ণপক্ষ। এই দুটি পক্ষ নিয়ে হয় একটি চান্দ্রমাস। একটি চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯.৫৩ সাধারণ দিন।

পূর্ণিমায় চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ১৮০° হয়। অমাবস্যায় এই দূরত্ব ০ ° । অর্থাৎ চাঁদ সূর্যের কাছে অবস্থান করে, আমাদের দিকে থাকে চাঁদের আলোহীন পৃষ্ঠ।

স্থির তারার সাপেক্ষে চাঁদ আকাশে প্রতিদিন প্রায় ১৩° ২০’ করে পূর্ব দিকে সরে আসে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা চাঁদের চলার পথকে ২৭টি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে এক একটি নক্ষত্র বলে চিহ্নিত করলেন এবং তাদের ২৭টি নামকরণ করেন। প্রতিটি নক্ষত্র একাধিক তারকা দ্বারা গঠিত। সুতরাং তারকা অর্থাৎ তারা এবং নক্ষত্র সংজ্ঞা অনুযায়ী আলাদা। চাঁদকে প্রতিদিন এক একটি নক্ষত্রের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে পরোক্ষে সূর্যের অবস্থানও নির্ণয় করা যায়। সূর্যের দৈনিক গতির পরিমাণ প্রায় ১° পূর্ব দিকে। সুতরাং সূর্যের তুলনায় চাঁদের দৈনিক গতি পূর্বদিকে প্রায় ১২° বেশী। এই ১২° পরিমাণ পথ পেরিয়ে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে তাই একটি তিথি। আরও খুঁটিনাটি জানতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তে হবে। বর্তমান প্রবন্ধে এইটুকু জানলেই চলবে।

আকাশে সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহদের বাদ দিলে মোটামুটি যে সব জ্যোতিষ্ক দেখা যায় তাদের স্থির তারা বলা হয়। বহু হাজার বছরে এদের পারস্পরিক কৌণিক অবস্থানের অতি সামান্য পরিবর্তন হয়, যা খলি চোখে ধরা পড়ে না। সূর্যের যে চারটি অবস্থান এবং সেই সম্পর্কিত দিনের কথা বলা হয়েছে, সেই দিনগুলিতে বৈদিক কালে যজ্ঞ করা হত। পৌরাণিক কালে এই দিনগুলিতে দেব-দেবীর পূজা বিহিত ছিল।

দুটি অয়নান্ত দিনে এবং দুটি বিষুব দিনে সূর্যের অবস্থান নক্ষত্রের প্রেক্ষাপটে জানা সম্ভব হয়েছিল। সেই যুগের মনিষীরা লক্ষ্য করেছিলেন দৈনিক গতি এবং সরণ ছাড়াও স্থির তারা এবং নক্ষত্রের প্রেক্ষাপটে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন হয়, সূর্য তার অবস্থান থেকে পশ্চিম দিকে (সেই যুগে) প্রায় ১° সরে যেত ৭২ বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় কালে। সূর্যের এই চলনকে বলা হয় “অয়ন চলন” , ইংরেজিতে Precession of Equinox.

এর পর আগামী সংখ্যায়

পেশীর সুস্থতা খুবই জরুরি

তাপস দে

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং ভুল খাদ্যাভ্যাস মানুষের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। হাত ও পায়ের পেশীতে ব্যথা এর মধ্যে অন্যতম। হাতে-পায়ে ব্যথা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কখনও কখনও এই ব্যথা হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে। এবং কখনও কখনও এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। যদিও পেশী ব্যথার সঠিক কারণ জানা যায়নি। কিন্তু কখনও কখনও ডিহাইড্রেশন, অত্যধিক ওষুধ সেবন, কোনও চিকিৎসা, অস্বাভাবিক স্নায়বিক নড়াচড়া বা অত্যধিক পরিশ্রমের কারণে এটি ঘটে।

অনেকেই এটি থেকে মুক্তি পেতে দামি ওষুধ খান। কিন্তু জানেন কি কিছু খাবারও এই ব্যথা উপশমে কার্যকরী হতে পারে ? অনেক সময়ে জলের অভাবে মাংসপেশিতে ক্র্যাম্প হয়। পেশী সঠিকভাবে কাজ করার জন্য হাইড্রেশন প্রয়োজন। এর জন্য তরমুজ একটি দুর্দান্ত বিকল্প। আসলে তরমুজে প্রচুর জল থাকে। এটি ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা পেশী ব্যথা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। ক্রীড়াবিদরা ক্লান্তি দূর করতে এবং তাদের পেশীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে নারকেল জল পান করে। এই জল শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতি দূর করে। এর পাশাপাশি

নারকেলের জলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস। যা মাংসপেশির ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

বেল ফল পেটের জন্য অমৃত হিসাবে বিবেচিত হয়। কমলা এবং হলুদ রঙের এই শরবত পান করলে শরীরে শক্তি আসে। তাপ থেকেও রক্ষা করে। এটি পটাসিয়ামের খুব ভাল উৎস, যা পেশীর ক্র্যাম্প কমাতে সাহায্য করে। পেঁপে একটি স্বাস্থ্যকর ফল, এতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মহিলারা পেঁপের মতো বেশি পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান তাদের পেশীতে ক্র্যাম্পের ঝুঁকি কম থাকে। স্যামন মাছ খুবই স্বাস্থ্যকর মাছ। যেটিতে শুধু ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডই নয়, প্রচুর প্রোটিন উৎস এবং ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, আয়রনও রয়েছে। যা রক্ত কণিকা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। এছাড়া মাংসপেশির ক্র্যাম্পের জন্যও স্যামন মাছ উপকারী।

কেমন আছে পৃথিবী

অনুমিতা দেব

গড় তাপমাত্রা বাড়লেই আগামী ৮০ বছরের মধ্যেই গলে যাবে হিমালয়ের দুই-তৃতীয়াংশ বরফ। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্টের (আইসিআইএমওডি) এক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন ভয়ঙ্কর তথ্য। এই প্রথমবারের মতো তৃতীয় মেরুর বরফ গলার হারের উপর চালানো হল গবেষণা। এই বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে পারলেও অর্ধেক বরফ গলে যাবে হিন্দুকুশ পর্বতমালার। আর এই তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লেই গলে যাবে দুই-তৃতীয়াংশ বরফ। হিমালয়ের হিন্দুকুশ পর্বতমালার বরফ গলার এই দ্রুত গতির কারণেই আগামী ৪০ বছরের মধ্যে পুরোপুরি ভেসে যাবে এই অঞ্চলে উৎপত্তি হওয়া গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেকং-সহ প্রধান ১০টি নদী ও তাদের অববাহিকাগুলি। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এই অঞ্চলের আশে পাশের থাকা ভারত, পাকিস্তান, চিন, আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান-সহ ৮টি দেশের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ। আর এই অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে সাময়িক প্লাবিত হলেও পরবর্তীতে আবার একেবারে শুকিয়ে যাবে নদীগুলো। তৃতীয় মেরুর বরফ গলার হারের উপর চালানো এই গবেষণার সঙ্গে টানা ৫ বছর ধরে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০০ জন বিজ্ঞানী। তাদের চালানো এই গবেষণার প্রতিটি স্তর আবার পর্যবেক্ষণ করেছেন বিভিন্ন দেশের আরও ৩৫০ জন বিজ্ঞানী।

উল্লেখ্য, আন্টার্কটিকা ও আর্কটিকের (সুমেরু ও কুমেরু) পর হিন্দুকুশ হিমালয়কেই পৃথিবীর ‘তৃতীয় মেরু’ বলা হয়ে থাকে।

লেখা ৬

দ্রুত বাড়ছে কোলেস্টেরলের সমস্যা

দেবেশ দাশ

দেশে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা দ্রুত বাড়ছে এবং বিপুল সংখ্যক যুবক এর শিকার হচ্ছেন। যে সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে ভুল জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এই সমস্যাটিকে মারাত্মক করে তুলেছে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তে পাওয়া মোমের মতো পদার্থ, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে রক্তের ধমনীতে জমা হয়। সেই কারণে হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ ব্যাহত হয়। শরীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হতে পারে। এমতাবস্থায় অসতর্ক থাকা মারাত্মক হতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি।

কোলেস্টেরল প্রধানত দুই ধরনের। প্রথমটি ভাল কোলেস্টেরল এবং দ্বিতীয়টি খারাপ কোলেস্টেরল। খারাপ কোলেস্টেরলের বৃদ্ধি হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় এবং বেশিরভাগ মানুষেরই এই সমস্যা রয়েছে। ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক থাকা উচিত, কারণ এটি প্রায়ই হ্রাস পায়। ভাল কোলেস্টেরলকে উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (HDL) এবং খারাপ কোলেস্টেরলকে কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (LDL) বলা হয়। এগুলি ছাড়াও রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড রয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ডাক্তারবাবুদের মতে, খারাপ কোলেস্টেরল যদি ১০০ mg/dL এর কম হয়, তাহলে তা

স্বাভাবিক। যদি এটি ১৩০ mg/dL বা তার বেশি হয়, তাহলে এটি বর্ডার লাইন। যদি এটি ১৬০ mg/dL এর বেশি হয় তবে এটি বিপজ্জনক হতে পারে। যখন রক্তে ভাল কোলেস্টেরল ৬০ mg/dL বা তার বেশি হয়, তখন এটিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। যদি পরিমাণ ৪০ mg/dL বা তার কম হয়, তাহলে এটি খুব কম বলে বিবেচিত হয় এবং এটি হার্টের স্বাস্থ্যকে আরও খারাপ করতে পারে।

এছাড়া যদি শরীরের মোট কোলেস্টেরল ২০০ mg/dL বা তার কম হয়, তবে এটি স্বাভাবিক হিসাবে বিবেচিত হয়। যদি এটি ২৪০ mg/dL হয়, তাহলে এটি বর্ডার লাইনে আছে বলে মনে করা হয়। যদি এটি ২৪০ এর বেশি হয় তবে এটি উচ্চ কোলেস্টেরল হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল ১৯০ mg/dL ছাড়িয়ে যায়, তখন এটি একটি বিপজ্জনক অবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, মানুষের অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত এবং চিকিত্সা করানো উচিত। এ ছাড়া মোট কোলেস্টেরল ৩০০ বা তার বেশি হলে এটি একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং এক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। এ ছাড়া, যদি আমরা ট্রাইগ্লিসারাইডের কথা বলি, তাহলে শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ ১৫০ mg/dL-এর কম হওয়া উচিত। এর বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এটি হার্টের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

চলো বেড়িয়ে আসি

ডলি সেন

ঘুরতে যেতে কমবেশি সকলেই পছন্দ করে। সকলের প্রিয় ডেস্টিনেশনের মধ্যে থাকে পাহাড় কিংবা সমুদ্র। তবে হাতে একদিন ছুটি থাকলে ঘুরে দেখতে পারেন জঙ্গলমহল। চারিদিকে সবুজ গাছে ঘেরা, মাঝখান দিয়ে চলেছে কালো পিচের রাস্তা, সে যেন এক মোহনীয় রূপ। একদিনের ছুটিতে ঘুরে দেখুন জঙ্গলমহলের পুরনো বেশ কিছু ইতিহাসক্ষেত্র ও মন্দির। একদিকে যেমন মন ভালো হবে তেমনি সবুজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন আপনিও। দিনের ক্লান্তি ভুলে একটা দিন কাটান পরিবার প্রিয়জনদের সঙ্গে।

নয়াগ্রাম ব্লক ঝাড়গ্রামে । এই নয়নাভিরাম জায়গায় দেউলবাড় এলাকায় রয়েছে প্রাচীন শিব মন্দির। মনে করা হয় ষোড়শ শতকে রাজা চন্দ্রকেতু এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আবার কারও মতে তৎকালীন সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজারা ছিলেন মারাঠাদের আশ্রয় এবং সমর্থনপুষ্ট। তৎকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি চালানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই মন্দির। তবে জনশ্রুতি নানা থাকলেও মন্দিরের গঠনশৈলী এবং জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এত সুন্দর ভাস্কর্য ও বিশ্বাস আপনাকে বারংবার টানবে। মন্দিরটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ওড়িশা রীতি অনুযায়ী মাকড়া পাথরের তৈরি এই মন্দির এবং যা পূর্বমুখী। বাইরে রয়েছে সুপ্রাচীন কাঁঠাল গাছ, যা নিত্য পুজো করা হয় এবং ভিতরে রয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ। ভক্তদের বিশ্বাস যা মানত করা হয় তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। প্রতিদিনই বেশ ভিড় লেগে থাকে এখানে। মন্দিরের চারপাশে

বেশ কয়েকটি স্তম্ভ রয়েছে। তার উপর রয়েছে বৃষভমূর্তি। শুধু তাই নয়, রামেশ্বর মন্দির থেকে অনতি দূরে রয়েছে তপোবন। যা মনে করা হয় বাল্মীকি মুনির সমাধিস্থল। চারিদিক গভীর জঙ্গলে ঘেরা একটি ছোট্ট মন্দির। শাল গাছের ছায়ায় এই মন্দির বেশ মন জুড়াবে আপনার। রয়েছে রাম-সীতার মন্দিরও। প্রাচীন বিশ্বাসে বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসেন এখানে।

তবে চারিদিকে সবুজে ঘেরা এই ক্ষেত্র। বছরে নির্দিষ্ট সময়ে পুজো এবং ভক্তসমাগম হলেও প্রতিদিনই বেশ ভিড় থাকে এখানে। শহরের ক্লান্তি কোলাহল ভুলে বহু পর্যটক ঘুরতে আসেন জঙ্গলমহলের এই বিশেষ পর্যটন কেন্দ্রে। সরকারিভাবে এলাকার নানা উন্নয়ন করা হয়েছে, হয়েছে চকচকে রাস্তা। তবে পরিবার পরিজন নিয়ে একদিনে ঘুরে দেখতে পারেন ইতিহাসক্ষেত্র এবং উপভোগ করতে পারেন সবুজ জঙ্গলে ঘেরা দুর্দান্ত পরিবেশ।

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (চতুর্থ পর্ব)

বাবলু সাহা

কাছে গিয়ে দেখি লিংঝি, প্যানোডার্মা সিচুয়ানেন্স, রিশি বা গ্যানোডার্মা গোত্রের ছত্রাক। এর লালচে বাদামী, বার্নিশ ব্যান্ড সহ কিডনী আকৃতির ক্যাপ এবং পেরিফোরালভাবে ঢোকানো স্টেম এটিকে একটি আলাদা ফ্যান বা হাতপাখার মতো চেহারা। বেশ কয়েকটি ছবি তুলে আবার ঘরে ফিরে এলাম।

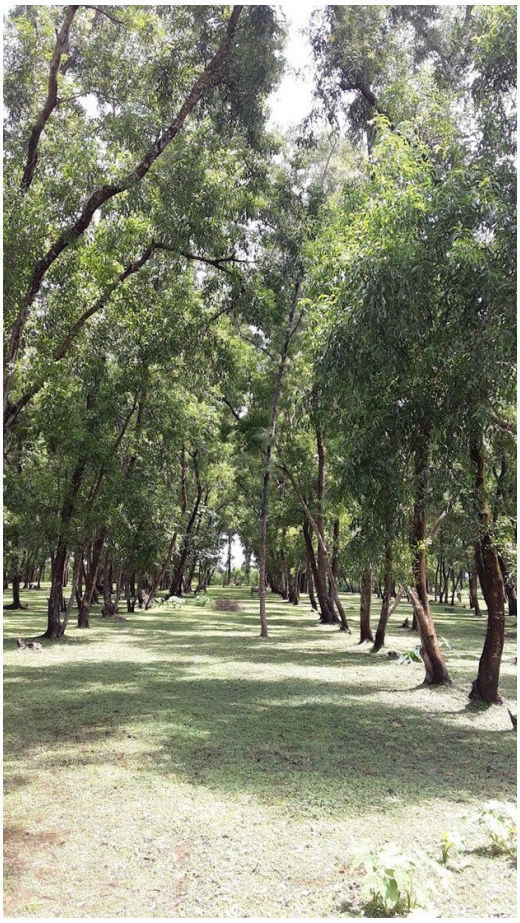

বিকেলবেলায় আলাপ হলো এই এলাকার একজন মান্যগণ্য বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবী জনৈক সন্তোষবাবুর সাথে। অত্যন্ত সজ্জন এবং অমায়িক একজন মানুষ। পরণে অতি সাধারণ ধুতি এবং ফতুয়া। দুই পুত্র এবং পুত্রবধূ, দুই ছোট নাতনি নিয়ে সুখের সংসার। ওনার মুখ থেকে এই বন্দাপ্তরের মুখ্য আধিকাকরিকের যে গল্প শুনলাম, তা অতি বিস্ময়কর এবং সম্ভ্রম জাগানো। এই বানদপ্তর এর ভার ওনার হাতে আসার আগে ছিল ভাঙাচোরা আর ছন্নছাড়া।

উনি দায়িত্ব নিয়ে আসার পরে নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে মাত্র তিন – চারজনকে সঙ্গী করে পুরো এলাকাটিকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলেন।

পুরাতন ভাঙ্গা ঘরগুলিকে নতুনভাবে সংস্কার করেন। আলাদাভাবে কর্মীদের জন্য কিচেন বানান। ভিতরের এরিয়ায় সুবিন্যস্ত ফার্ম হাউস গড়ে তোলেন।

এরপর একদিন ওনার ঘরে থাকা ছোট মেয়ের শিক্ষার সাহায্যের কারণে এই বনদপ্তর থেকে ওনার বাড়ির কাছাকাছি থাকা অন্য বনদপ্তরে বদলি হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেখবর গ্রামময় রাষ্ট্র হতে দেরী হয়নি।

এরপর একদিন সকালে সান্তোষবাবুর অধীনে সমস্ত গ্রামবাসী মিলে একত্র হয়ে ওনাকে ঘেরাও করে বদলীর আদেশ বাতিল করে এখানেই থেকে যাওয়ার অনুরোধ করায়, উনি ওনার পূর্ব সিদ্ধান্ত বদল করতে একরকম বাধ্য হন। এরপর থেকে আজ অবধি ওনার একটি পরিবারের মতো একসাথেই আছেন।

সন্ধ্যার দিকে মাথায় হেডটর্চ লাগিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঘন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন সবে বৃষ্টি থেমেছে। লম্বা লম্বা শর গাছের গোড়ায় অনেকটা করে জল জমে আছে। আমারা সাধারণ জুতো পড়েছিলাম। প্রচন্ড সাপের উপদ্রব থাকাটা খুব স্বাভাবিক।

তখনও ঠিকভাবে খোঁজ নেওয়া হয়নি, জেলিংহ্যাম বন্দর ঠিক কোন পথে গেলে পাবো। এদিকে তখন সমুদ্র এগিয়ে আসার গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমরা দুজন অনেক চেষ্টা করেও সে রাতে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলামনা।

শেষে বন দপ্তরের ঘরে ফেরার জন্য গেটের কাছে আসতেই দেখি আমারা ভিতরেই আছে ভেবে গেটে তালা মেরে দিয়েছে। অগত্যা আমরা লম্বা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো উঁচু সিঁড়ি টপকে ভিতরে ঢুকে আসি। কিচেনের যে বয়স্ক অস্থায়ী কর্মিটি খাবার বানান, তিনি আমদের ঘরে এসে দুপুরে দেখা সেই গাছের পেঁপে ছোলার তরকারী আর হাত রুটি দিয়ে, আগামীকাল খুব ভোরে কখন সমুদ্রের বুকে সেই অবিস্মরনীয় সূর্যোদয় হবে এবং সহজে যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিলেন।

পরদিন খুব ভোরবেলায় উঠে আমরা জামা – প্যান্ট গুটিয়ে ওই অর্ধেক জলে ডোবা শর বনের জঙ্গল ভেদ করে একটি ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছলাম আমাদের কাঙ্খিত সেই ঐতিহাসিক অধুনা লুপ্তপ্রায় জেলিংহ্যম সমুদ্র বন্দরে। তখনও আবছা অন্ধকার। সূর্য উদিত হয়নি।

এর পর আগামী সংখ্যায়

ফিরে দেখা (চতুর্থ পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

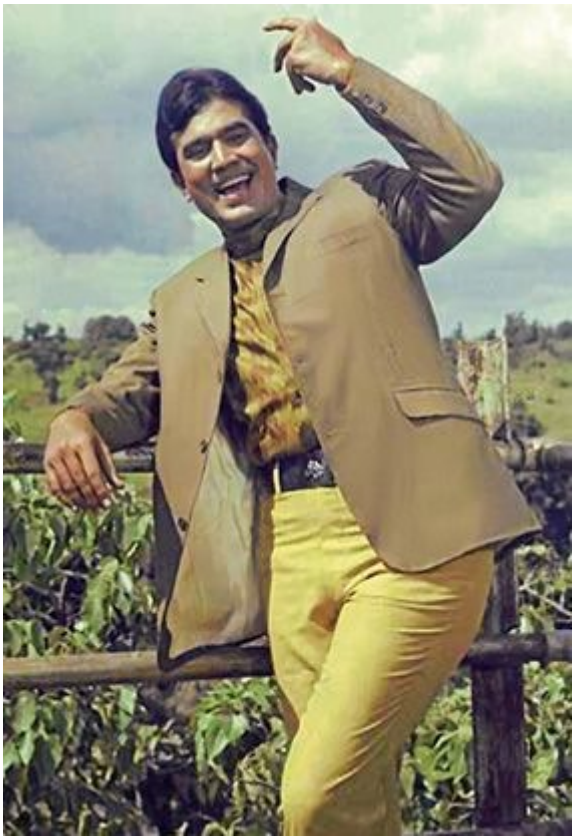

আর, এ প্রসঙ্গেই চলে আসে এই ছবির নায়ক রাজেশ খান্নার কথা।

তখন অনেক সিনেমাপ্রেমী দর্শকের কাছে হার্টথ্রব।

বাংলায় তাঁকে অভিহিত করা হতো ' গুরু ' বলে (এবং বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারকে)।

এতটাই তার জনপ্রিয়তা ছিল যে, তাঁর হেয়ার স্টাইল, গুরু কলার ফুলহাতা পাঞ্জাবী – চুড়িদার, তার কথা বলার স্টাইল রপ্ত করা একপ্রকার শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল।

সুচিত্রা হল চত্বরে প্রবেশের মুখে ' হাতি মেরে সাথী ' দীর্ঘদিন ধরে শো শুরু হওয়ার অনেক আগেই হাউসফুল বোর্ড ঝোলানো থাকত। এরপর প্রতিটি সিনেমাহলের বাইরে এরসাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত টিকিট ব্ল্যাকারদের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এছাড়াও অনেক হলেই বড় ব্যানারে নামি দামী নায়কের ছবি রিলিজ করলে ফুল দিয়ে গেট সাজানো হত। এরপর ঘনিয়ে এলো সুচিত্রা হল নিয়ে সেই বিষাদময় দিন।

সেসময়ে অর্থাৎ ৭০এর দশকে বেহালার রাস্তা ছিল মাত্র ৬০ফুট চওড়া। অনেক গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন এই রাস্তা ধরে চলাচল করতো এবং ধীরে ধীরে যানবাহনের চাপ বাড়ছিল।

ফলে, তখনকার প্রশাসন ও সরকার স্থীর করেন রাস্তা চওড়া করে ১২০ফুট (আরও পরে ১৮০ ফুট) করার। তখনও বেহালায় এখনকার বাইপাস জেমস লং সরণী তৈরী হয়নি।

ওই রাস্তার দু-ধারে থাকা যাবতীয় দোকান - বিপণি (যার মধ্যে আমাদেরও বিপণি ছিল), হকার, ছোট কারখানা, সিনেমাহল ইত্যাদির মালিকদের কাছে নোটিস এলো সমস্ত ভেঙে দিয়ে রাস্তা চওড়া করার। এবং, এই রাস্তা চওড়া করার সীমানা ছিল

তারাতলা ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে বেহালা ট্রামডিপো পর্যন্ত।

এরপর একদিন ভাঙ্গা শুরু হলো।

এর পর আগামী সংখ্যায়

ইউরোপের ডায়েরি (পঞ্চম পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

আজ দেখা হবে পিসার হেলানো মিনার বা লিনিং টাওয়ার অফ পিসা। এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। যে কোন নতুন জিনিস বা জায়গা দেখার আগে মনের মধ্যে বেশ এক আগ্রহমিশ্রিত উত্তেজনা তৈরী হয়। নতুন কি দেখবো।

ব্রেকফাস্ট সেরে সবাই তৈরী। সবাই উঠতেই বাস ছেড়ে দিল ।

পিসা হল মধ্য ইতালির টাসক্যানের একটি সুন্দর শহর। এই জায়গা লিনিং টাওয়ারের জন্য বিখ্যাত হলেও আরও অনেক দর্শনীয় জিনিস আছে এখানে, যেমন, মধ্যযুগীয় প্রাসাদ, ঐতিহাসিক গির্জা, আর্ণো নদীর ওপরে সেতু প্রভৃতি। বিখ্যাত পিসা বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েছে এখানে যা দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কার। পিসা কথাটির অর্থ হল মুখ, যেহেতু শহরটি আর্ণো নদীর মুখে অবস্থিত।

নানা ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে এটি একটি প্রাচীন শহর। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। একাদশ শতাব্দীতে এর গৌরব বৃদ্ধি পায়। এরপর এই স্থান নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। একসময় এটি বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্মস্থান ছিল এই শহর।

বাস আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে গেল। বেশিক্ষণ দাঁড় করানো যায় না। কিছু দূর যেতেই দৃশ্যমান হল সেই বিখ্যাত লিনিং টাওয়ার।

এই টাওয়ারের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল 1173 সালে । যখন তৃতীয় তল নির্মাণ শুরু হয়, তখন থেকেই এটি হেলতে থাকে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, নরম মাটিতে দুর্বল ভিত এবং ত্রুটিপূর্ণ নকশাই ছিল হেলে যাওয়ার কারণ। এরপর এটি একটু একটু করে হেলে যেতেই থাকে। এই হেলে যাওয়া রোধ করতে সংস্কারসাধন করা হয়। চারটি ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে গেছে এই টাওয়ার । এর উচ্চতা 56 মিটার এবং ওজন, 14500 টন।

কথিত আছে যে গ্যালিলিও এই টাওয়ারের ওপর থেকে একটি পরীক্ষা করেছিলেন ।

দেশবিদেশ থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এসেছেন এই অনন্য সৌধ প্রত্যক্ষ করতে। আমরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ছবি তুলতে লাগলাম। টাওয়ারের সামনে গিয়ে দেখলাম ভালো করে। ভাবতে অবাক লাগে যে এই হেলে যাওয়া অবস্থাতেই এটা কতদিন ধরে টিকে রয়েছে।

এক দারুণ জিনিস দেখলাম। বলল নীলাঞ্জনা।
হ্যাঁ ,একদম অন্যরকমের । আমি বললাম ।

রূপকথার ও ভালো লেগেছে জায়গাটা ।

আরে নীলাঞ্জনা না!
অর্পিতা তুই!
যাক, চিনতে পেরেছিস তাহলে।
চিনতে পারবো না! বাব্বা , কতদিন বাদে দেখা।

দুই বন্ধুই উচ্ছসিত বহুদিন বাদে দেখা হয়ে।

সে পরিচয় করিয়ে দিল তার স্বামী ও ছেলের সঙ্গে । ছেলে রূপকথার বয়সী।

ওরা এসেছে অন্য একটা ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে।

এবারে আমরা বাইরে বেরিয়ে কফি আর টুকটাক খেয়ে নিলাম।

একজন বাংলাদেশী ফোলডিং ছাতা বিক্রি করছিল, লিনিং টাওয়ারের ছবি দেওয়া। কেনা হল কয়েকটা। নীলাঞ্জনা জাঙ্ক জুয়েলারী কিনল একজনের থেকে।

আরো দেখা হল পিসা ক্যাথেড্রাল ,পালাজো ব্লু, যা হল একটি মিউজিয়াম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ,পালাজো ডেলা ক্যারোভানা ,যা হল একটি প্রাসাদ।

এবারে যাওয়া হবে ফ্লোরেন্স দেখতে।

ফ্লোরেন্স হল ইতালির টাসক্যান অন্চলের এক রাজধানী শহর। মধ্যযুগে এটি ছিল ইউরোপের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ।মনে করা হয় যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ এই স্থান থেকেই শুরু হয়। এটি ছিল এক সমৃদ্ধ শহর এবং শিল্পকলা , সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি , বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। একসময় এটি ছিল গৌরবের শিখরে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এই শহরকে। 1865 থেকে 1871 পর্যন্ত এটি ছিল ইতালির রাজধানী। এই শহরকে মনে করা হয় পৃথিবীর সুন্দরতম শহরগুলির মধ্যে একটি। এখানে রয়েছে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী প্রভৃতি। এখানকার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর, বিজ্ঞানী, লেখক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বিখ্যাত ভাস্কর মাইকেল অ্যাঞ্জেলো , বিখ্যাত কুশলী রাজনীতিবিদ নিকোলো মেকিয়াভেলি প্রভৃতিরা । বাস থেকে নেমে আমরা হাঁটতে থাকলাম। অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে এদিকে সেদিকে। এক জায়গায় উঁচুতে টেলিস্কোপ রাখা আছে। আমরা অনেকে দেখলাম চোখ লাগিয়ে।

এবারে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম পরের গন্তব্যে। রাস্তার ধারে প্রচুর দোকান, জামাকাপড়, জুতো, জুয়েলারীর । নীলাঞ্জনা একটা ফ্লোরেন্টাইন লেদারের ব্যাগ কিনল।

উফিজি গ্যালারি বা গ্যালারি দেগলি উফিজিতে গিয়ে দেখা হল রেনেসাঁ যুগের শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম ।দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এখানে রয়েছে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ,লিওনার্দো দ্য

ভিঞ্চি, তিতিয়ান, বোটিসেলিদের মত বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ। এখানকার দরজাগুলি ব্রোঞ্জের তৈরী এবং খুব সুন্দর। একে বলা হয় গেট অফ প্যারাডাইস ।

এসব দেখে মন ভরে গেল সবার। শিল্পকলার কদর সবার কাছে।

শুনেছি আগে ,এখন চাক্ষুষ দেখা হল। বললাম আমি। সত্যিই অসাধারণ! বলে উঠলেন পান্ডেজি ।
ঐ দেখো, ঘোড়ার গাড়ি। রূপকথা বলে উঠলো।

সুসজ্জিত অশ্বশকট রয়েছে সামনে।

চারদিকে রয়েছে অপূর্ব সব ভাস্কর্য এবং কারুকার্যের সমাহার। কিন্তু সময় তো চলেই যাচ্ছেই।যেতে হবে অন্য জায়গায়।

কাছেই অনেক পিৎজার দোকান। পিৎজা বানাচ্ছে হাতে গরম। আমাদের এখানে যেমন রোল চাউমিন বানায়। সবাই মিলে খাওয়া হল। বেশ একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। ইতালিতে বসে গরম গরম পিৎজা খাওয়া। চমৎকার স্বাদ। অন্য জায়গায় এই স্বাদ পাইনি।

এই অন্চলেই রয়েছে পিয়াজা ডেলা সিগনোরিয়া। এখানেও রয়েছে অপরূপ সব ভাস্কর্য। এটি হল শহরের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র।

আরো দেখা হল ডুওমো ক্যাথেড্রাল ডি সান্তা মারিয়া ডেল ফিওরে। এর সুন্দর গম্বুজটি বিখ্যাত। রেনেসাঁ যুগের স্থপতি, ব্রুনেসেলচি এর সৃষ্টি করেছিলেন। কপোলায় বেশ কিছু ধাপ ওঠার পর সমগ্র নগরীর এক সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

ভীষণ ভালো। বলল নীলাঞ্জনা।

পালাজ্জো ভেচিও হল একটি মধ্যযুগীয় টাউন হল এবং নাগরিক শক্তির প্রতীক। এখানে রয়েছে সুন্দর ফ্রেস্কো , গোপন সুড়ঙ্গ, রোমান ধংসাবশেষ, প্রভৃতি।

অনেক দেখা হল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অনেকেই ।একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে যাওয়া হল রাতের খাওয়া সারার জন্য। ভালোই খাওয়া হল। আরো ভালো হল শেষপাতে মিষ্টি থাকায়।

ইউরোপে এই সময়ে দেখছি অনেকক্ষণ দিনের আলো থাকে, প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ।

সবাই আলোচনা করতে লাগলো যা যা জিনিস দেখা হয়েছে তা নিয়ে।

কালকে যাওয়া হবে ভেনিস দেখতে। সবাই যে যার ঘরে চলে গেল বিশ্রাম নিতে।

রূপকথা তো বিছানায় শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপরে ভেনিস ,আর গন্ডোলা রাইড। বললাম আমি।

দারুণ হবে। হাসিমুখে বলল নীলাঞ্জনা।

লেখা ১১

সাত সমুদ্দুর পারের দেশ জার্মানি

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

এসেছি জার্মানিতে কিছুদিন শাশুড়িগিরি ফলাতে খুড়ি মুনাইয়ের সঙ্গে ফুর্তিতে কাটাতে, কিন্তু কাটাবো কী? প্রথমদিনই যা অভিজ্ঞতা হলো সেটা না বললে পেটে গুড়গুড় করছে!

ফাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে বাক্সপ্যাঁটারা নিয়ে বসে আছি বেশ কিছুক্ষন বাদে মুনাই লাফাতে লাফাতে এক বাক্সো লিন্ডের চকোলেট নিয়ে আমায় ওয়েলকাম জানালো, ফুরফুরে মেজাজ।.. এ পর্যন্ত বেশ ছিল! কিন্তু তারপরই দেখি মুনাই সিরিয়াস, চলো কাকিমা বাস ধরে টার্মিনাল দুই থেকে এক যাবো....এই শুরু হলো আমার ভাঙাচোরা দুবলা হাঁটু দুটো নিয়ে পথ চলা....মনে মনে বললাল, চল ধন্যু, আজ তেরা বাসন্তী কী ইজ্জত কা সওয়াল!

বেশ কিছুটা হাঁটলাম বটে, কিন্তু দিব্যি ঝাঁ চকচকে নধর কান্তি বাসে উঠেও শান্তি! কিন্তু ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। এক ঠেঙে বক হয়ে একবার এ পায়ে তো একবার ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে.... সঙ্গে ঐ সাতাশ কিলো ওজনের তুঁতে রঙের সুন্দরী পৃথুলা স্যুটকেসটি! মুনাই কিছুতেই সেটিকে আমার হাতে দেয় না.... ভয়ে...পাছে কাকিমা ব্রেকবিহীন হাঁটু আর যমদূতের মতো ভারি বাক্স নিয়ে ডিরেলড হয়ে সোজা গিয়ে গোঁত্তা খায়।ওদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথা শুরু হয়েছে।

যাই হোক, বাসে করে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেশনে এলাম। সুন্দর গোছানো গাছানো ধনীবাড়ির বৈঠকখানা ঘরের মতোই চোখ টানে। ট্রেন এলো। হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে দুজনে স্যুটকেসখানি তুললাম কিন্তু বসার জায়গা দুর্লভ!আমি যাও বা পেলাম, মুনাই স্যুটকেস আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। ভারি আশ্চর্য লাগলো! ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা কেমন একদিকে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেলো,ভেতরের যাত্রীরা একে একে নেমে এলেন নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে.... তারপর এরা উঠলেন। কি দারুন সিস্টেম আর আন্ডারস্টান্ডিং। এমন টেনশনবিহীন ট্রেনেও চড়া কেন গাছে চড়াও দেখিনি জন্মে! অবাক হচ্ছি! আর ভাবছি এ কোন দেশে এলাম! দাঁড়াও দাঁড়াও সব বুঝবে! মুনাইয়ের এই কথার মানে তখন ধরতে পারিনি! আসলে চমকটা তো ছোটগল্পের শেষেই থাকে! তেরো মিনিটের পথ প্রায় কুড়ি মিনিট লাগলো...ওদিকে মুনাইয়ের চিন্তিত মুখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ। কাকিমা পরের ট্রেন ধরে আমাদের চারঘন্টার পথ যেতে হবে লাইপজিগ শহরে। সে কি রে? আর তো মাত্র চার মিনিট সময়!

ওদিকে বোর্ডে দেখাচ্ছে একই সময়ে একই প্ল্যাটফর্মে দুটো ট্রেন ঢুকবে! তারমানে একটা ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বদলে যাবে! সেটা কোনটা! আমাদেরটা না তো? হ্যাঁ ঠিক তাই! নামতে নামতে শুনলাম, কাকিমা আমাদেরটা ১ এ দিয়েছে, আছি ৯ নং প্ল্যাটফর্মে হাতে সময় তিনমিনিট,টিকিট কেটে সীট রিজার্ভ করা,দাম ১৮০০/-টাকা। এতোগুলো ফ্যাক্টার একসঙ্গে কাজ করছে..... দৌড়োও....স্যুটকেস নিয়ে মুনাই.... পিছে পিছে আমি... সারা স্টেশন জুড়ে বিদেশীরা দেখছে দুই দেশি গার্লের ছুট!এক হাঁটু খাবলা করে ধরে লেংচে লেংচে হেঁচকি তুলতে তুলতে সে কি দৌড়.... যন্ত্রণায় ব্রহ্মাতালু ফুঁড়ে কান্না বেরিয়ে আসছে যেন! যাক! অবধারিত ভাবে সুন্দরী ট্রেনটি কোমর দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেলেন! মুনাই রেগে গেছে কিন্তু এবার! আমাকে একজায়গায় বসিয়ে, দাঁড়াও তো বলে ধাঁ করে ছুট.... কিছুক্ষন পরে ফিরে এসে জানালো পরের ট্রেন ১.১৭. আবার ১৮০০/টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে তো? সে যাক! কী করা যাবে আর? সেটাই তো.... টিকিট কাটতে হবে না! যেহেতু ওদের ভুলে আগের ট্রেন লেট হবার জন্য

আমরা কানেকটিং ট্রেন মিস করেছি তাই ওই টিকিটেই হবে। কিন্তু রিজার্ভেশনটা পাবে না।

এও আবার হয় বুঝি! যাক বাবা উঠতে পারলেই হলো। ও কাকা! ট্রেন তো বেশ লেট! তায় ৯ নং প্ল্যাটফর্মে আবার দুটো ট্রেন! তারমানে আবার প্ল্যাটফর্ম বদল!!! কিছুদূর গিয়ে আটকে আছি, বদল হলেই উলটো দিকে দৌড়! নয়তো সোজা দিকে জোরে হাঁটা! হ্যাঁ ঐ তো ট্রেন ঢুকছে..... কাকিমা! প্ল্যাটফর্ম পালটে দিয়েছে! আট! দৌড়োও! আবার!....

হাঁউমাউ করে কাঁদতে বাকি রেখেছি দুজনে। উঠলাম। এবার সীট! সবই তো রিজার্ভ! এক এক জন তো আবার টাকা দিয়ে সীট বুক করে ফাঁকা রেখে দিয়েছেন....উনি কারোর পাশে বসতে নারাজ! মুনাই একটা গ্যারেজে স্যুটকেসটাকে ঢুকিয়ে সীটের সন্ধানে বেরোলো। আমাকে একটা জায়গায় থিতু করিয়েছে.... এক ঘন্টার জন্য। পরের স্টেশনে উঠে যেতে হবে। এদের প্রতিটা সীটের পাশের লেখা থাকে কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশন পর্যন্ত রিজার্ভ! আবার অবাক হলাম! এইবার ফিসফিস করে মুনাই এসে জানালো ট্রেনের সেরা দুটি সীট কেন যেন ফাঁকা। রিজার্ভেশন ফ্রাঙ্কফুর্ট টু বার্লিন! ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়ে তো ট্রেন বেরিয়ে গেলো.... তারমানে কোনভাবে যাত্রীদুটি ট্রেন মিস করেছে... তবে আমরা বসি! বসো তো, যদি আসে তখন দেখা যাবে! এ তো দিব্যি পুরী হাওড়া ট্রেনের মতোই ফাঁকা পেলেই বসে পড়া আবার সঠিক পাবলিক এসে পড়লে উঠে দাঁড়ানো! ঢপ ঢপ.... সবই আমাদের মতোই কাকিমা। দেখনদারি..... ট্রেনে ওঠার দুমিনিট আগে প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে যাত্রীদের এই হয়রানি করানো নাকি এদের আদত! প্রায়শই করে থাকে। শুনেছিলাম আগে এবার কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা হলো! মুনাই গড়গড় করে বলে চলেছে। আরো অবাক হলাম! ঝকঝকে ট্রেনের মেঝেতে প্রেমিক যুগল প্রেমের অতিশয্যে প্রায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর এক যুগলের লিপ যেন আজন্মের মতো লক হয়েই গেছে....এক বুড়ো ট্রেনের দরজা ধরে তার সাইকেলটিকে থ্রিফোল্ড ছাতার মতো বগলদাবা করে

ট্যাবলেটে তাস খেলেই চলেছে.... আরে আপদ! ট্রেন তো থামছে রে! নামবো তো! দোর ধরে বসে আছে দেখো! দরজা খোলার পর ওনার চেতনা এলো....

অবশেষে লাইপজিগ....মুনাই-পমের পাড়া! ভারি ভাইব্র্যান্ট জায়গাটা! প্রাচীন আভিজাত্যে মোড়া স্টেশনটা... আর্চ,ঘড়ি,স্থাপত্য সৌকর্য, পায়রা সব মিলিয়ে মুহূর্তটা কেমন খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো! কিছুক্ষণ আগের যন্ত্রণাময় বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা ধুয়েমুছে সাফ! আবার ছোট্ট মিষ্টি একটা ট্রামে উঠলাম তারপর দশমিনিট বৃষ্টি ধোয়া পথ ধরে বাড়ি। পাক্কা তিরিশ ঘন্টা পথের যে নুড়ি পাথর কুড়িয়েছি সে কি আর একদিনে বলা যায় গো! সব্বাই ভালো থেকো।

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতায় হয়ে গেল প্রথম থ্রিলার লিট ফেস্ট

অভিযান পাবলিশার্সের আয়োজনে হয়ে গেল বাংলা ভাষার প্রথম থ্রিলার লিট ফেস্ট। অভিযান বুক কাফেতে আয়োজিত ৮ দিনের এই লিট ফেস্টের সহযোগিতায় ছিলেন অক্ষর সংলাপ, বিভা প্রকাশন, অভিনব মন এবং কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ৮ দিনের এই লিট ফেস্টের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, সুস্মিতা সাহা এবং শ্রীমন্ত বসু। বাংলা থ্রিলার ও গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস এবং বর্তমান নিয়ে নানান দিক থেকে ৮ দিন ২২ টি সেশানে এই লিট ফেস্টে আলোচনা করেন সুমিতা চক্রবর্তী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ভি রামস্বামী শুভজিৎ রায় রজত পাল অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় প্রীতম সেনগুপ্ত তপোব্রত ভাদুড়ি সন্দীপ সেন সুস্নাত চৌধুরী মুস্তাক আহমেদ রনিত দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখক শিল্পী আলোচকরা। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে এই নভেম্বরেই প্রথম ঢাকা থ্রিলার লিট ফেস্ট।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন